

Reading Materials

ইয়ং বেঙ্গল (নব্যবঙ্গ) আন্দোলনের প্রভাব

Influence of Young Bengal movement

Semester 4 / History Generic Elective 4:

KRITISUNDAR SARDAR

Associate Professor of History

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Govt. College

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজের তরুন অধ্যাপক হিনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীরা বাংলায় পাশ্চাত্য ভাবধারায় যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন অল্প কথায় তা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ বা ‘নব্যবঙ্গ’ আন্দোলন নামে পরিচিত। ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীদের লেখা বই, প্রবন্ধ, কবিতা, শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ’ ইত্যাদি রচনা থেকে নব্যবঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল—শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবাদ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নব্যবঙ্গের সদস্যরা হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস যেমন—কঠোর বর্ণভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, ব্যাভিচার, খাদ্যের বাছবিচার, হিন্দুশাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস, নারীদের উপর আরোপিত নানা বিধি-নিষেধ, অস্পৃশ্যতা, প্রাচীন শাস্ত্রকেন্দ্রিক দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, পৌত্তলিকতা—এসবের কঠোর সমালোচনা করতেন। তাঁরা এগুলি ধ্বংস করে পশ্চিমী শিক্ষা, ভাবধারা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের পক্ষেও মতপ্রকাশ করেন। তাঁরা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করে হিন্দু সমাজকে একটি প্রবল ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি হিন্দু

সমাজে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারন, এগুলির অধিকাংশ প্রগতিশীল হলেও তাদের অতি মাত্রায় নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম তৎকালীন হিন্দু সমাজ ভালো চোখে দেখেনি।

নব্যবঙ্গের সদস্যদের সংস্কারমূলক কাজকর্ম ও চিন্তাধারা বাংলার সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা এবং কুসংস্কারের সমালোচনা এবং সেগুলির বিরোধীতা করতে গিয়ে হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এর উপর তাঁদের আক্রমণ অনেক সময় দৃষ্টিকটু ও উত্তেজক বলে মনে হত, যা আদতে স্বয়ং ডিরোজিও অনুমোদন করতেন কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং বাংলার মানুষের পক্ষে তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল গোঁড়া ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিরা। তাঁরা মনে করতেন হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা এবং কুসংস্কারগুলির সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক হল এইসব সমাজপতিরা। সমাজে জিইয়ে থাকা বিভেদ, বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার মূলেও তারা। তাঁরা তাদের সমালোচনা করার পাশাপাশি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। কিন্তু ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁদের সংস্কার আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। এর কারণ, তাঁদের আন্দোলনে জনসমর্থনের অভাব ছিল।

নব্যবঙ্গের সদস্যরা রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদেরও রেহাই দেননি। রামমোহন একদিকে যেমন সতীদাহ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির মতো কিছু কুপ্রথার সম্পূর্ণ অবসান চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমন যুক্তিসহ শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয়দের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজের এই পদ্ধতি তাঁদের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা এইজন্য রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের ‘অর্ধ উদারনীতিক (half liberals)’ বলে উপহাস করেছেন। স্বয়ং ডিরোজিও তাঁদের সম্পর্কে ১৮৩১ খ্রিঃ ৫ই মার্চ ‘ইন্ডিয়া গেজেট’-এ লিখেছিলেন “...It is easier to say what they are not than what they are...”。 তাঁরা রামমোহনের অনুগামীদের স্বার্থান্বেষী ও

সুবিধাবাদী বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের মতাদর্শকে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর বলে সমালোচনা করেছেন। আসলে রামমোহন হিন্দু সমাজের শুধু কুসংস্কারগুলির অবসান বা সংস্কার চেয়েছিলেন। কিন্তু নব্যবঙ্গের সদস্যরা হিন্দু ধর্মের প্রতি এতটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন যে তাঁরা এর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তাঁদের এই চরম মানসিকতা বাংলার সমাজ সুনজরে দেখেনি।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের উগ্র মতামত প্রচার করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘এনকোয়ারার’ পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ চালান। ‘দ্য পার্সিকিউটেড’ নাটকে তিনি হিন্দুদের ‘ভন্ড’ বলে উপহাস করেছেন। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদস্বরূপ তিনি ১৮৩৭ খ্রিঃ খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহনের এই ধরনের কাজকর্ম বহু হিন্দু অনুমোদন করেনি।

নব্যবঙ্গের সদস্যরা হিন্দুদের কিছু অন্ধ বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করেন। হিন্দুরা গঙ্গাজলকে পবিত্র বলে মনে করত। ডিরোজিওর ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক এর বিরোধীতা করে বলেন “I do not believe in the sacredness of the Ganges.” হিন্দুদের গোমাংস, মদ ইত্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। এগুলি গ্রহণ করলে তারা ধর্মচ্যুত হত। নব্যবঙ্গের সদস্যরা এইসব নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় প্রকাশ্যে গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের এই ধরনের আচরণে অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি থাকলেও কোন শঠতা ছিল না। কিন্তু তাঁদের এইসব নেতিবাচক আচরণ হিন্দু সমাজ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি।

ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার প্রসার ঘটেছিল। তাঁরা ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও ইংরেজী ভাষার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করেন। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের দাবি জানিয়ে প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে চালু হয়েছিল ‘এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন’, ১৮৩৮ খ্রিঃ

স্থাপিত হয়েছিল ‘সোসাইটি ফর দ্য এ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ’, ‘মেকানিক্যাল ইন্সটিটিউট’ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাঁদের উগ্র পাশ্চাত্যানুকরণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা ও স্থায়িত্ব বাড়েনি।

হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্ধবিশ্বাস, জাতিভেদ—এসবের বিরুদ্ধে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ডিরোজিও এবং নব্যবঙ্গের সদস্যরা বিভিন্ন আলোচনা সভা বা বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি একাধিক বই ও পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে ডিরোজিওর ‘পার্শ্বন’, ‘এ্যাথেনিয়াম’, ‘হেসপেরাস’, ‘ক্যালকাটা লিটারারী সোসাইটি’; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘এনকয়ারার’; রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ‘জ্ঞানান্বেষণ’; তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ‘কুইল’, ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ‘ক্যালকাটা ম্যাগাজিন’, ‘বেঙ্গল অ্যানুয়াল’, ‘ক্যালিডোস্কোপ’ ইত্যাদি পত্রিকাতেও তাঁদের লেখা প্রকাশিত হত। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকায় তাঁদের রচনা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে হিন্দুরা সন্দেহের চোখে দেখত। ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁদের বক্তব্য ও রচনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হত। সুতরাং তাঁদের বক্তব্য হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্বাগত ছিল না।

শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষে আন্দোলনের মধ্যে নব্যবঙ্গের সদস্যদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতে বৃটিশ অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও তাদের অপশাসনের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, আদালতে জুরী প্রথার প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো দাবি জানান। মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলনে নেমে ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রিঃ হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাস দত্ত বৃটিশ-ভারতে আইন প্রবর্তনে সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা না থাকায় কঠোর সমালোচনা করেছেন। নব্যবঙ্গের একজন

সদস্য ‘ক্যালকাটা মাসুলী জেনারেল’ পত্রিকায় এক চিঠিতে ভারতের দুর্দশা মোচনের জন্য বৃটিশ শাসন অবসানের প্রয়োজনের কথা লিখেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা কোন বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটেননি।

প্রকৃতপক্ষে নব্যবঙ্গের সংস্কার আন্দোলন কিছু দিনের জন্য ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও ডিরোজিওর মৃত্যুর কিছুদিন পর স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তাঁদের চিন্তাধারা যতখানি ইতিবাচক ও গঠনমূলক, তার চেয়ে ঢের বেশি নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক ছিল। তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্কার বা পুনর্গঠন নয়, উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধীতা করতে গিয়ে প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে চরম হঠকারীতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া পরবর্তী কালে নব্যবঙ্গের বহু সদস্য এই আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। যেমন, পরে ডিরোজিওর শিষ্যদের অনেকে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। মতানৈক্য থাকলেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। আবার নব্যবঙ্গের সদস্যরা ছিল ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ ছিল না। ফলে তাঁদের আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিল না। এই সমস্ত কারণে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নব্যবঙ্গ আন্দোলনের কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁদের ‘...a generation without fathers and children.’ বলে কটাক্ষ করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, তাঁদের প্রভাব সমাজের এক ক্ষুদ্র গভীকে স্পর্শ করেছিল মাত্র। সমাজের বৃহত্তর অংশের জনমত তাঁদের পক্ষে ছিল না। তবুও আধুনিক ভারতের এর অবদান ও গুরুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।